প্রস্তাবনা

ঐতিহাসিক পটভূমি : পাকিস্তান প্রস্তাব, রাজনীতি ও ভাবাবেগ

এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বে পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের কবিতাকে, সেখানকার রাজনৈতিক আবহ ও ঘটনাক্রমের অভিঘাত কতখানি প্রভাবিত করেছে, তা পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ। কিন্তু প্রস্তাবনা এবং প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পটভূমিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কারণ পাকিস্তান গঠনের পর পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে একাধিক কারণে ক্রমাগতই রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ বুঝতে পারেন যে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভাষা-সংস্কৃতির তুলনার অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ধর্মকে। সে-জন্য মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। এর পরেও নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে গণ-প্রতিরোধ চলতেই থাকে। অবশেষে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে বাঙালি। গঠিত হয় নতুন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'। এই দীর্ঘ সময়ে রাজনীতি, বাংলাদেশের জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ—পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালির লড়াইয়ের যে যাত্রাপথ, এটাই পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের কবিতার মূল চালিকাশক্তি। এই দীর্ঘ সময়ে যে-সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই তার মূলে রয়েছে এই সময়পর্বের নানা রাজনৈতিক অস্থিরতা, আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলী। সে-কারণে কবিতায় রাজনৈতিক অভিঘাত পর্যালোচনা এই গবেষণা-কর্মের মূল উদ্দেশ্য হলেও কালগত অভিঘাতের তাৎপর্য অক্ষুণ্ন রাখতে এখানে এই সময়পর্বের ইতিহাসও সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এই ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করেই গবেষণা-কর্মের কবিতা সংক্রান্ত পরবর্তী অধ্যায়গুলি রচিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস বিপুলভাবে আলোড়িত হয়েছিল। কারণ দীর্ঘ দু'শো বছরের পরাধীনতার শেষে এই উপমহাদেশের আধিবাসীরা

লাভ করেছিল মুক্তির আস্বাদ। আমরা পেয়েছিলাম বহু প্রতিক্ষীত 'স্বাধীনতা'। এই স্বাধীনতা কেবল দু'শো বছরের ইতিহাসে নিছক কালের বহমানতার মধ্যে দিয়ে আসেনি বরং এর পিছনে ছিল দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সংকট, আন্দোলন, রক্তক্ষয়ের ইতিহাস। ইংরেজদের স্বৈরাচারী ঔপনিবেশিক শাসন, অর্থনৈতিক শোষণ, ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের প্রয়াস প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রতিবাদে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মনে বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের জন্ম হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে তা ক্রমে সংগঠিত চেহারা নিতে থাকে। প্রথম সূচনা দেখা দিয়েছিল অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদে নিম্নবগের্র মানুষের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে ফরাজি আন্দোলন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার মুসলিম সমাজের উপর এই আন্দোলন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল বাংলার দরিদ্র মুসলমান কৃষিজীবীরা। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাজি শরিয়ৎ উল্লাহ। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ফরাজি' নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধর্ম সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও অচিরেই এই আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠে যে নিছক ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই নয়, ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করে মুসলিম শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই এর মূল উদ্দেশ্য। যদিও পরবর্তীকালে নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা, হিন্দু-বিরোধী মনোভাব, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও যথার্থ নেতৃত্বের অভাবে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে 'ওয়াহাবি' আন্দোলন শুরু হয়। ভারতে এই আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সৈয়দ আহমদ। বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মির নিশার আলি বা তিতুমির। তাঁর নেতৃত্বে নির্যাতিত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মহাজন ও নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল কোম্পানির রাজস্ব ব্যবস্থার অধীনে চলে আসে। এই অঞ্চলের বসবাসকারী দরিদ্র সাঁওতালদের

উপর জমিদার ও সরকারি কর্মচারিরা রাজস্ব আদায়ের নামে শোষণ শুরু করলে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিধু-কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ ইংরেজরা নির্মমভাবে দমন করেছিল। ফরাজি, ওয়াহাবি আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনও ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী। তবে এর মধ্যে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালে (১৮৫৬-১৮৬২) সংঘঠিত সিপাহী বিদ্রোহ ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্রোহ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ পরাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের, শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রথম দেশের নানা প্রান্ত থেকে স্বাধীনতার দাবিকে উষ্কে দিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহকে বাঙালি প্রত্যক্ষভাবে ততটা সমর্থন করেননি। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের অনতিকাল পরে বাংলায় নীলবিদ্রোহ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন আদায় করে নিয়েছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে। এই সময় ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পরস্পরকে একই দেশের ও একই সংস্কৃতির মানুষ বলে গ্রহণ করতে মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৮৬৭ তে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার নামকরণই এই মনোভাবের পরিচয়। যদিও হিন্দুমেলা মুসলিম-বিরোধী ছিল না, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের নামে 'হিন্দু' শব্দটিকে জুড়ে দেওয়ার সময় উদ্যোক্তাদের মনে কোনও প্রশ্ন জাগেনি। এ-প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেছেন—"উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুরা স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্মপ্রীতির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। মুসলমানরা আবার স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্মপ্রীতিকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করেছেন যে, ধর্মপ্রীতির আতিশয্যে দেশকে তাঁরা স্বদেশ বলে ভাবেননি। ভারতবর্ষের বাসিন্দা হয়েও তারা নিজেদের ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন আরব, ইরান ও তুরস্কে।"[১]

হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই একদিকে ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক। কিন্তু অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল নবজাগরণের চেতনা। নিজেদের সমাজকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে

যেতে হবে একথা স্বীকার করেও হিন্দুরা ছিল দেশীয় ইতিহাস ও অতীত সংস্কৃতির উপর মোটের উপর শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু মুসলমানদের মনোভাব ঠিক তেমন ছিল না। তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রমী মানুষ ছাড়া ভারতবর্ষকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেননি। তাঁরা ভারতভূমির অধিবাসী হলেও ভারতরাষ্ট্রের জনগণ হতে চাননি। তাঁদের কাছে পশ্চিম এশিয়ার আরব, ইরানই ছিল প্রকৃত স্বদেশ এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উৎস। উচ্চবর্গীয় মুসলমানরা মনে করতেন যে তাঁরাই ছিলেন ভারতের শাসক; ইংরেজরা এসে তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করেছে। এই কারণে তাঁরা ব্রিটিশের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এবং এই বিরোধী মন নিয়েই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাঁরা গ্রহণ করতে চাননি।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ভারতীয়দের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখবার চেষ্টাই করেছিলেন এই দলের নেতৃবৃন্দ। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতেই তাঁদের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। নরমপন্থীরা আলোচনা ও আবেদনের ভিত্তিতে পরিবর্তনের প্রত্যাশা করতেন ও সেই মতো প্রচেষ্টা চালাতেন। কিন্তু চরমপন্থীরা স্বরাজের দাবি তোলেন। আবেদনের পরিবর্তে দাবি এবং সেই অনুসারে শাসকের প্রতি অসহযোগিতা, ধর্মঘট, বয়কট ইত্যাদি পথ অবলম্বন করেন।

এই সময় লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে লর্ড কার্জন-এর শাসনকাল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর আমলেই রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন বাঙালিকে দুর্বল করে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হলেও জীবনযাপন ও জীবিকার দিক থেকে হিন্দু-মুসলমানের অবস্থান সমতুল্য ছিল না। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে অর্থনৈতিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। উনিশ শতকে সিপাহী বিদ্রোহের কালেও হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকরা ইংরেজকে সমর্থন করেন এবং তার ফলে কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। সেই মনোভাব মুসলমানদের না থাকায় উনিশ

শতকে মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসকের কাছে ছিল উপেক্ষিত কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দিকেই তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং মনে করে যে ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করলে তাঁরাও সুবিধা পাবেন। ফলত বিশ শতকের প্রথমার্ধে পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়ায় বিপরীত। অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয় যখন সশস্ত্র বিপ্লব, কংগ্রেসের চরমপন্থী আন্দোলন, গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ ইত্যাদির পথ ধরে ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে উঠেছেন, তখন মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে কিছুটা সহযোগিতা বজায় রেখে নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের এই রাজনৈতিক অবস্থান বৈষম্যকে ব্রিটিশ সরকার সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে তৎপর হয়েছিল। হিন্দুদের থেকে দূরে সরে মুসলমানদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা দিলে মুসলমান শ্রেণিকে যেমন কাছে রাখা সুবিধা হবে তেমনি মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের মতাদর্শগত দ্বন্দ্বও বৃদ্ধি পাবে। এই সুযোগ কার্জন হাতছাড়া করেননি। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এনড্রু ফ্রেজারের পরামর্শে লর্ড কার্জন চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহকে আসামের সঙ্গে একত্রিত করার প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন দুই বাংলা পরিদর্শনে আসেন। এই সময় ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ (১৮৬৬-১৯১৫) এই অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য নতুন প্রদেশ দাবি করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, পার্বত্য ত্রিপুরা ও আসাম নিয়ে গঠিত হয় ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশ।[২] এই সময় এই প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল তিন কোটি দশ লক্ষ। সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়, প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ। এই পরিকল্পনা কার্যকর হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর। বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া হয় দ্বিবিধ। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ কেবল বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে সমর্থন করেননি বরং এই কাজে কার্জনকে সহায়তা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের ঘটনায় সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ব্রিটিশের হাতে অত্যাচারিত হওয়ার পর তাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের সমস্যার কিছুটা নিরসন হল। তবে নিরঙ্কুশভাবে সমগ্র মুসলমান জনসমাজ কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে সমর্থন করেনি। বরং সর্বভারতীয় মুসলমান নেতারা বঙ্গভঙ্গের

বিরুদ্ধে হিন্দু নেতাদের আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থনই করেছিলেন। কামরুদ্দীন আহ্‌মদের মতে—''বঙ্গদেশের বর্ণ-হিন্দুরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আরম্ভ করে দিল এক ব্যাপক গণ আন্দোলন। কারণ তাঁদের অস্তিত্বই হয়ে পড়েছিল বিপদগ্রস্ত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনের কৃপায় হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বণিক-সম্প্রদায়ের, তারা লাভ করেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের নেতৃত্ব, সরকারি চাকুরি এবং জমিদারি।.... এছাড়াও উভয় বাংলাতেই বাঙালি হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। এমনকি, পশ্চিমবাংলাতেও বাঙালি হিন্দুদের সংখ্যা বিহারী ও উড়িয়াদের তুলনায় ছিল কম। কাজেই তারা চরম সংকটের মুখোমুখি হয়ে ব্রিটিশ-পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য বদ্ধ পরিকর হল। বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, আচার ও প্রথা-এসবের দোহাই দিয়ে তারা যে আবেদন করল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি জনসাধারণের কাছে, তার প্রচণ্ড প্রভাব যে হিন্দু-সম্প্রদায়কেই অভিভূত করল তা নয়,মুসলমানদের সহানুভূতিও লাভ করল।''[৩]

বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে মুসলমানদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে স্যার সলিমুল্লাহ্ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য নেতাদের নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গঠিত হয় 'নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ'। এই লিগের আদর্শ ও লক্ষ্যের মধ্যে ছিল—মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভক্ত ও অনুগত করে তোলা এবং সরকারের কার্যকলাপের জন্য মনে কোনও সংশয় উদয় হলে তার নিরসন করা, ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকারকে রক্ষা করা।[৪] বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন প্রবল রূপ ধারণ করে ক্রমে বিলাতি-দ্রব্য-বর্জন আন্দোলন তথা স্বদেশি আন্দোলনে পরিণত হয়। অনুশীলন সমিতি (১৯০২) ও যুগান্তর দল (১৯০৬) এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এই সময়ের একটি ঘটনা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকরী হয়, এই বছরই জাপান রাশিয়াকে আক্রমণ করে পরাজিত করে। একটি শ্বেতাঙ্গ জাতির এমন পরাজয়ের ঘটনায় প্রাচ্যের

বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তীব্র আন্দোলন শুরু করে। এরই মধ্যে কার্জন পদত্যাগ করলে লর্ড মিন্টো ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে মিন্টোর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হলে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনি ঘোষণা করেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে আসবেন এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। এই আগমনের পূর্বে ভারতসচিব জন মর্লে বঙ্গদেশ পুনর্গঠনের নতুন পরিকল্পনা করেন। ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করেন। বাংলা ভাষাভাষী পাঁচটি বিভাগ নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ। বিহার ও উড়িষ্যা বঙ্গদেশ থেকে পৃথক হয়। তবে একথা সত্য বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদ হলেও ব্রিটিশ সরকার বিশেষ করে লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়েছিল। বিভিন্ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছিল। সমালোচক বদরুদ্দীন উমর এ-প্রসঙ্গে বলেছেন— "এইভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা পুনরায় একত্রিত করে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হলেও এর দ্বারা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির যে অবনমন শুরু হয়েছিল তাকে রোধ করা সম্ভব হল না। উপরন্তু সাম্প্রদায়িকতা পরবর্তী পর্যায়ের সংসদীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে।"[৫]

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এরই মধ্যবর্তী সময়ে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রচেষ্টায় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' নামে সুপরিচিত এই চুক্তিতে দেশের বিভিন্ন আইনসভায় সম্প্রদায় অনুসারে হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনের পন্থা এবং তাঁদের সংখ্যা নিরূপণের প্রণালী বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাংলার মুসলমানরা এই চুক্তির কোনও সুফল লাভ করতে পারেননি। কারণ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সংখ্যালঘু মুসলমানরাই এর সুবিধা ভোগ করেছিলেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধিজী ঘোষণা করেন যে অসহযোগ আন্দোলন সফল হলে এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতা আসবে। কিন্তু ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজী জেলবন্দি হন। এই সময় চিত্তরঞ্জন দাশ জেল থেকে ছাড়া পান এবং 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন। হিন্দু-মুসলমান সমতা রক্ষায় তিনি হিন্দুদের সংখ্যাধিক্যকে উপেক্ষা করে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে এক চুক্তি করেন যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত। তাঁর এই উদারতা ও দৃঢ় মনোভাব হিন্দু-মুসলমানের মানসিক দূরত্ব কমাতে সক্ষম হত যদি কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্ব এর বিরোধিতা না করত। এই বিরোধিতা যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে কথা স্বীকার করে আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন—"দেশবন্ধুর সেদিনকার মর্মস্পর্শী উদাত্ত আহ্বান আমার কানে, এবং বোধ হয় আমার মত অনেক বাংগালীর কানে আজো রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে: "হিন্দুরা যদি উদারতার দ্বারা মুসলমানের মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে না পারে, তবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আসিবে না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যতীত আমাদের স্বরাজের দাবি চিরকাল কল্পনার বস্তুই থাকিয়া যাইবে।""[৬] ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের কোকনদ অধিবেশনে চুক্তিটি প্রত্যাখ্যাত হয়। এই ঘটনায় মুসলমানরা জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল।

জাতীয় কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করলেও চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-এর সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে এই চুক্তি অনুমোদন করার চেষ্টা করেন। চুক্তিটি এই সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে চুক্তিটি আর বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে দলমত নির্বিশেষে হিন্দুরা জমিদারের পক্ষে এবং মুসলমানরা প্রজার পক্ষে ভোট দেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল করে। এই ঘটনায় মুসলমানরা কংগ্রেসের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারান। ফলস্বরূপ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান কংগ্রেসপন্থীরা মওলানা আকরম খাঁ'র নেতৃত্বে 'নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেন। স্যার আব্দুর রহিম এই সমিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খাঁ সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এইভাবে হিন্দু-মুসলমান দূরত্ব

ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে কবি ইকবাল পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন। তাঁর প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্রে কিন্তু পূর্ব-বাংলার উল্লেখ ছিল না। কেবল পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলির উল্লেখ ছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ইংল্যাণ্ড থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নিযুক্ত হন। এই সময় ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহর 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি'তে নবাব, নাইট জমিদার, ব্যবসায়ীরা একতাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির প্রধান সদস্যরাই মুসলিম লীগে যোগদান করেন। দেশে ফেরার পর জিন্নাহ্ 'মুসলিম লীগ' পুনর্গঠনে মন দেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'কৃষক প্রজা সমিতি'। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা সমিতির মতবিরোধ প্রকাশ্যে এলে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কৃষক প্রজা সমিতি ও মুসলিম লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১১৯ আসনের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টি পায় ৪৩ আসন, মুসলিম লিগ পায় ৩৮ আসন।[৭] কংগ্রেসও এই নির্বাচনে সাফল্য লাভ করেছিল এবং আপসহীনভাবে ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠনে সমর্থনও দিয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে শর্তনামার ক্রমিক নম্বরকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা সমিতির সমঝোতা নষ্ট হয়। জিন্নাহ্ এই বিরোধকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম লীগকে, কৃষক প্রজা সমিতিকে সমর্থন করতে বলেন। ফলস্বরূপ মুসলিম লীগের সমর্থনে ফজলুল হক বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর আমলেই 'কৃষক প্রজা সমিতি' তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় মুসলিম লীগ বাংলার মুসলমানদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারণ—''সাইত্রিশের নির্বাচনে বাঙালী হিন্দুরা যতখানি উৎসাহহীন ও হতাশা-পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, বাঙালি মুসলমানেরা হয়েছিলেন ততোধিক দুর্বার ও দুর্জয়। এই উৎসাহ আগে কোনোদিন বাঙালি মুসলমান সমাজে আসেনি, অথবা বাঙালি মুসলমান অনুভব করেনি।''[৮] এই উৎসাহের আবহেই ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ

লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৭-তম অধিবেশন শুরু হয়। প্রকাশ্য এই অধিবেশনে ফজলুল হক ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক রূপ সম্বন্ধে মুসলিম লীগের মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবটি 'লাহোর প্রস্তাব' নামে মুসলিম লিগের কার্য-বিবরণীতে উল্লিখিত হলেও সংবাদপত্রগুলিতে তা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসাবে প্রকাশিত হয়। এ-প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহ্মদ বলেছেন—"জনাব জিন্নাহ্ সাহেব, যিনি শুরুতে লাহোর প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ নিশ্চিত ছিলেন না, এখন সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করলেন যে, ঐ প্রস্তাবটি হচ্ছে ভারতের মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লিগের ত্রিংশতম অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করলেন,'মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের জন্য একটি উপযুক্ত নাম খুঁজছিলেন। হিন্দুরা লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান' আখ্যা দিয়ে আমাদের সেই অনুসন্ধানকে সাহায্য করেছেন।' জনাব জিন্নাহ্ সাহেব বললেন, 'এর জন্য হিন্দু সাময়িক পত্রিকাগুলির কাছে মুসলিম লীগ কৃতজ্ঞ'। তখন থেকেই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব বলে পরিচিত হল।"[৯] এই প্রস্তাবে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি—"that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constitute, which such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constituted "Independents States" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."[১০] এই প্রস্তাবকে হাতিয়ার করে ভারতীয় মুসলমানরা বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কাজেই পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্রটিকে বোঝার জন্য এই প্রস্তাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করা দরকার। কারণ—"লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে যে বিষয়টি সবথেকে উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করার প্রস্তাব।"[১১]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন, কারণ সাইত্রিশের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করতে পারেননি। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ফজলুল

হকের মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে এবং খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করে। নভেম্বর মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে আবুল হাশিম বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। আবুল হাশিম বাংলার তরুণ মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। কারণ বহু তরুণ মুসলমান প্রাদেশিক সভার সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় আবুল হাশিমের স্বীকারোক্তিতে—''আমার কাজ ছিল মাতৃ সংগঠন মুসলিম লীগকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা।.....সর্বসাধারণের কাছে আমি ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা প্রচার করতাম এবং মুসলিম লীগকে একটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়ে তুলতে তাগিদ জানাতাম। .....ইসলামের একজন অতিউৎসাহী প্রচারক হিসাবে আমি মুসলিম লীগ মঞ্চ থেকে ইসলামের হযরত মহম্মদ(দ:)-এর নেতৃত্বে ইসলামের খেলাফতে কিভাবে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিলো তা প্রচার করতাম। এরদ্বারা বাংলার মুসলিম যুবসমাজ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো এবং তারা ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের পাঁচ লক্ষাধিক দুই আনার সদস্য তালিকাভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলো।''[১২] এরই মাঝে সুভাষচন্দ্র বসু ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করেন। সুভাষহীন কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্যদিকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে ভারতের মুসলমান যুবসমাজ। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন—''পাকিস্তান সরকার ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে পাকিস্তানের জনগণের প্রধান অংশের মতামত নিয়ে পরিচালিত হবে (will have the sanction)।''[১৩] ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের সকল প্রার্থীই নির্বাচিত হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চে অনুষ্ঠিত সারা ভারত নির্বাচনে বাংলার মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। এপ্রিল মাসে জিন্নাহ্ কেন্দ্রীয় আইন সভার লীগ সদস্যদের নিয়ে একটি সভা করেন এবং আবুল হাশিমের মতো নেতার আপত্তি সত্ত্বেও লাহোর প্রস্তাব সংশোধিত করে নতুন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি যেখানে বলা হয়েছিল—''that two separate constitution-making bodies be set up for

the people of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective constitutions."[১৪]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং সেই সঙ্গে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল—"এই প্রস্তাব দ্বারা মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন সকলেই সমবেতভাবে তাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের পিছনে দাঁড়ায় এবং যেন প্রস্তুত থাকে যে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার জন্য।"[১৫] ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অগাস্ট মুসলিম লীগ পূর্ব প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত অনুসারে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালন করতে উদ্যোগী হয়। ঐদিনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তাক্ত হয় কলকাতার রাজপথ। এই ঘটনায় বাংলার মুসলমান সমাজ লাহোর প্রস্তাবের আদর্শকে কার্যত ভুলে যায়। মতাদর্শকে উপেক্ষা করে সম্প্রদায়গতভাবে বিভক্ত হয়ে যায় দুটি ধর্মীয় গোষ্ঠীতে-হিন্দু ও মুসলমান। এই রকম ভয়ানক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে তারা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগ করবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ৩ জুন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ৯ জুন মুসলিম লীগ, জিন্নাহ্‌কে ভারত বিভাগের ক্ষমতা প্রদান করে। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অগাস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সফল হয় মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন। পাকিস্তান আন্দোলন সাম্প্রদায়িক ছিল এই অর্থে যে তা ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিল না। আসলে 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'কে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ পাকিস্তান আন্দোলন সফল করার রণকৌশলরূপে কাজে লাগিয়েছিলেন। 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' হচ্ছে এমন একটি ধারণা যেখানে হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি ভিন্ন জাতিরূপে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' সম্পূর্ণ খাটে না। কারণ মধ্য যুগ থেকেই বহু হিন্দু ভারতীয় বিভিন্ন কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের জাতির বিচারে ভারতীয় বলেই ধরতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকের এই ধারণাটি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে চেয়েছিল যে হিন্দু ও মুসলমান দুই পৃথক জাতি।

তাদের পক্ষে এক দেশে বসবাস করা সম্ভব নয়। এই ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব’কে ব্যবহার করেই মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ অগাস্ট গণ পরিষদের ভাষণে জিন্নাহ্ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তাঁর তাৎক্ষণিক কৌশলভিত্তিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন—“এখন আমার মতে এই উদাহরণ আমাদের সম্মুখে রাখতে হবে আমাদের আদর্শ হিসাবে এবং আপনারা দেখতে পাবেন যে, এমন এক সময় আসবে, যেদিন হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না, ধর্মীয় অর্থে অবশ্য নয়, কারণ তা হল প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তা হবে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে রাজনৈতি অর্থে।”[১৬] যদিও জিন্নাহ্র এই আদর্শ যে পাকিস্তানের সর্বসাধারণের উপর প্রযোজ্য হয়নি তার প্রমাণ পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তানে গঠিত আন্দোলনগুলি। রাজনৈতিক জটিলতার কারণে পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম থেকেই দেখা দিল সম্পর্কের সংকট। পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ ধর্মে মুসলমান হলেও ভাষায়, পরিধানে, খাদ্যাভ্যাসে সবোর্পরি জীবনযাপনে বাঙালি সংস্কৃতির অর্ন্তভুক্ত। অন্যদিকে আরব থেকে আমদানি করা ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি যেহেতু আরবভূমিতে প্রোথিত, তাই আরবি-ফারসি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রশাসকরা ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে তৎপর হলেন। এখানেই পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁদের শুরু হয় আধিপত্য বিস্তারের সংঘাত।

পাকিস্তান আন্দোলন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করলেও নতুন রাষ্ট্র পাওয়ার আস্বাদ পূর্ব-বাংলার মুসলমান পেতে শুরু করেছিলেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ থেকে। কারণ ঐদিনই মুসলিম লীগের তরফে গৃহীত হয়েছিল লাহোর তথা পাকিস্তান প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবের পর থেকেই বাংলার মুসলমানরা নিজেদের ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার দিকে উদ্যোগী হলেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশে চারের দশক ছিল সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিবাদী চেতনার কাল। কবিতায়, গানে ও সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায় এই সমাজ-চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল তীব্রভাবে। অন্যদিকে পাকিস্তানী রাজনৈতিক চেতনার প্রভাবে সে সময় মুসলমান সমাজে আত্ম-

অন্বেষণের পথ ধরে স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে যা এক পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকতার চরিত্রও পরিস্ফুট করে তোলে। এর ফলে চারের দশকের বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজ মানসিকতার দিক থেকে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ছিলেন উদারচেতা তরুণ মুসলমানরা, অন্যদিকে ছিলেন ধর্মাশ্রয়ী গোঁড়া মুসলমানরা। ফলস্বরূপ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সমালোচক আহমদ রফিকের মতে—‘‘এর ঐতিহাসিক কারণ, এককথায়, বঙ্গবাসী দুই প্রধান সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশের অসমতা এবং সেইসূত্রে উদ্ভূত রাজনৈতিক পাথর্ক্য ও বিভেদ।’’[১৭] সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বরাবর গভীর। বিশ শতকের চারের দশকে পূর্ব-বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়ে। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এই ঘটনায় আলোড়িত হয়ে কাব্য, উপন্যাস, নাটকে সাম্প্রদায়িক ভাব জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তান, যার মূল ভিত্তি ছিল ইসলাম, সেই ইসলামকে সাহিত্যে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এইসব বুদ্ধিজীবীদের মূলমন্ত্র। হুমায়ুন আজাদের মতে—‘‘এরা যে শিল্পগত দিক দিয়ে খাঁটি সাহিত্যিক ছিলেন এমন নয় বরং পাকিস্তানবাদকে সাহিত্যে সঞ্চারিত করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। পাকিস্তানবাদী সাহিত্য সৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল পাকিস্তান প্রস্তাব: এবং যারা এতে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ সৃষ্টিশীল লেখক ছিলেন না। কেউ ছিলেন সাংবাদিক--কেউ প্রাবন্ধিক; এবং তাঁদের পরবর্তী জীবন প্রমাণ করেছে যে তাঁরা সবাই ছিলেন প্রগতি বিমুখ।’’[১৮]

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বাঙালি মুসলমান লেখকদের একাংশ পাকিস্তান-কেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন যেখানে শিল্পগুণ কম, সাম্প্রদায়িকতা অনেক বেশি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় গঠিত হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি’। এই সোসাইটির মূল নীতিগুলো ছিল—জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ, পাকিস্তানবাদ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক বক্তৃতা, বিতর্ক, পুস্তক প্রচার, সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদী মহিলা ও ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে পাকিস্তানি ভাবধারার সম্প্রসারণ, জাতীয় সংস্কৃতির উন্মেষক ও সহায়ক

আন্দোলনের সঙ্গে অধ্যয়নগত যোগাযোগ স্থাপন, সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিমূলক আবেদনের রূপায়ণ, পাকিস্তান-বিরোধী সর্বপ্রকার প্রগতিশীল ভাবধারার গতিরোধ। কিন্তু নীতিগুলি যুক্তিযুক্ত ছিল না কারণ লাহোর প্রস্তাবের কার্য বিবরণীতে স্পষ্টতই বলা ছিল—“That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in three units and in the regions for the protection of their regions, culture, economic, political, administrative and other rights...”[১৯] এরপর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে ঢাকায় তৈরি হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’। এই সংসদের মূল নীতি ছিল যেকোনো প্রকারে সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ প্রচার। ‘পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি’ এবং ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’ দুটি প্রতিষ্ঠানই দেশ বিভাগের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত, তখনও ‘পাকিস্তান’ রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। অথচ প্রতিষ্ঠান দুটির নামের সঙ্গে ‘পাকিস্তান’ শব্দবন্ধ যুক্ত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় দুটি প্রতিষ্ঠানেরই মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সমর্থন ছিল। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি’র ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তানি সাহিত্যের বিচার কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন—“রাজনৈতিক বিচারে পাকিস্তানের অর্থ যাই হোকনা কেন সাহিত্যিকদের কাছে তার অর্থ তমদ্দুন আজাদী। সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারাল অটোনমি।.....কিন্তু কোথায় পাকিস্তানের সাহিত্য? পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। তবু এ সাহিত্য পাকিস্তানের সাহিত্য নয়।.....অর্থাৎ এ সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ প্রাণ-প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছেনা।”[২০]

১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব বাংলা তথা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা কবিতায় আদর্শ নিমার্ণের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তবে দেশ বিভাগের অনেক আগে থেকেই বাংলা কবিতায় আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে

বাংলাদেশ গঠনের সময় পর্যন্ত বাংলা কবিতার দুটি পৃথক ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথম ধারাটি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ এবং দ্বিতীয় ধারাটি ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের কিছু সময় পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। প্রথম ধারাটি ইসলামি ধারা হিসাবেই সমধিক পরিচিত। তবে ১৯৪৭-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তীপর্বে ইসলামি কবিতার বিকাশ ঘটলেও এর সূচনা হয়েছিল বিশ শতকের চারের দশকে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকে। যদিও এই সময়পর্বের সমস্ত কবিই পাকিস্তানবাদের সমর্থক ছিলেন না। কারণ এই সময়পর্বের মধ্যেই আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, সানাউল হকের মতো কবিদেরও পাওয়া যায়, যাঁদের কবিতায় পাকিস্তানবাদ নয় রোমান্টিসিজম ছিল প্রধান। যদিও পাকিস্তানবাদের প্রচারকারীদের মধ্যে স্বাধীনচেতা এই সমস্ত কবিদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। সমালোচকের ভাষায়—‘‘অল্প ব্যতিক্রম ছাড়া এ সময়ের কবিকুল স্বতন্ত্র আবাসভূমি স্পষ্ট করে লিখলে লিখতে হয়, পাকিস্তানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ ছিলেন।’’[২১] এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন—শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, সুফী জুকফিকার হায়দার, ছদরুদ্দীন, আজহারুল ইসলাম, রওশন ইজদানী, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ। এই কবিদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় পাঁচজনকে নির্বাচন করে তাঁদের কবিতায় এই প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান সম্পর্কিত ভাবাবেগ কীভাবে ভাষারূপ পেয়েছে তা আলোচনা করা হল।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)

উনিশ শতকের একেবারে শেষ পর্বে কবি শাহাদাৎ হোসেনের আবির্ভাব। পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালীন তিনিই একমাত্র কবি, যিনি বাংলা কবিতায় মুসলিম জাগরণী সুর সংযোজন করেছিলেন। অবিভক্ত ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় যে অনেকটাই পিছিয়ে পড়া এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছে অবহেলিত এক সম্প্রদায় তা তিনি অনুভব করেছিলেন। নিজের ধর্ম এবং জীবন যাপন করা সমাজকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন বলেই তাঁর কাব্য-ভাবনায় ইসলামের সুর সংযোজিত হয়েছে। তাঁর ধর্ম সম্পৃক্ত দর্শনের কথা স্বীকার করে আব্দুল মান্নান বলেছেন—"তাঁর আত্মদৃষ্টির অন্তত দুটি পরিচয় আমি উল্লেখ করতে চাই : একটি তাঁর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, আর-একটি তাঁর ট্র্যাজিক বোধ। যতো স্বপ্নচারীই হোন, শাহাদাৎ হোসেন তাঁর নিজস্ব ধর্ম ও সমাজকে বিস্মৃত হননি, বরং ইসলাম ও মুসলমানকে তিনি তাঁর স্বপ্নের অংশ করে তুলেছিলেন।"[২২] তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তিনটি—'মৃদঙ্গ' (১৯২৮), 'কল্পলেখা' (১৯২৯), 'রূপছন্দা' (১৯৫০)। বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে তাঁর কাব্য-চেতনায় তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়। প্রথম ধারায় রয়েছে ইসলামের প্রাণ পুরুষ হযরত মোহাম্মদ ও ইসলামিক আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কবিতা। এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবিতা হল—'রমজান', 'মহরম', 'না'ত', 'কোরবানি', 'ঈদ-উল-ফিতর', 'শওয়ালের চাঁদ', 'ঈদের চাঁদ', 'বিদায় রমজান' প্রভৃতি। মন ও মেজাজের দিক থেকে ইসলামপন্থী হওয়ার জন্য তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে ইসলামের জয়গান করেছেন। ইসলামের প্রাণ পুরুষ হযরত মোহাম্মদ তাঁর আদর্শ। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে বিশ্বব্যাপী মুসলমান ধর্মের বিকাশে হযরত মোহাম্মদ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেও তিনি নিজেকে কখনও স্রষ্টা ভাবেননি। সে-জন্য সারা বিশ্বে তিনি আজ একজন দৃষ্টান্ত স্বরূপ। একথার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের 'সওগাত' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হযরত মোহাম্মদ(সা)' কবিতায়। যেখানে কবি বলেছেন—

> 'খোদার করুণা-মানব মূর্তি ধরিয়া মর্ত্যে উরিলে তুমি,
> বহালে পুণ্য শান্তি-নিঝর ধরায় নামিল স্বর্গ ভূমি।

মূর্ত সাধনা তুমি গো মর্ত্যে জগৎ-পাতার মহান দান,
আর্য মানব সিদ্ধ তাপস, বিশ্ব কবির প্রাণের গান।'[২৩] (হযরত মোহাম্মদ)

রমজান মাস মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ সাধনার সময়। এই সময় মুসলমানরা মানসিকতার দিক থেকে ত্যাগ ও ধর্মে বলীয়ান হয়ে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। এই মাস তাই মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে বহুল প্রত্যাশিত ও কল্যাণকর। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে মুসলমানরা অবহেলিত। তাই রমজানের উদ্দীপনা তাঁরা জাগিয়ে তুলতে পারছেন না। বঞ্চনা, উপেক্ষা, অনাচার, অত্যাচারের মিলিত সম্মেলনে চারিদিকে কেবলই শোকস্তব্ধ শূন্যতা। কবির কণ্ঠে ধরা পড়েছে আর্তের হাহাকার—

'আনন্দের হাসি কোথা, কোথা নব জীবনের গান
সুরাহা ভগ্নকণ্ঠে ফোটে শুধু ব্যথা-ভরা করুণার তান।
বিপুল এ পৃথ্বী আজি দাবদগ্ধ পড়ে আছে বিরাট শ্মশান--
গৌরবের মহা অবসান;'[২৪] (রমজান)

তবে কেবল হতাশার হাহাকারেই কবি নিমগ্ন থাকেননি। পরাধীন দেশের প্রতিকূল পরিবেশে নবজীবনের গানে মুসলমানদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি--

'কঙ্কাল প্রেতের কণ্ঠে জাগাইয়া তোলো নবজীবনের উদ্বোধন গান
দিক হতে দিগন্তরে ধরণীর মর্ম্মকেন্দ্র ঘন মুখরিয়া
স্বাগতম রমজান গীতকণ্ঠে উঠুক রণিয়া।'[২৫] (ঐ)

রমজান, মহরমের মতো 'ঈদ'ও মুসলমানদের কাছে একটি পবিত্র উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে লেখা 'ঈদ-উল-ফিতর' কবিতাটি। ঈদ-উল-ফিতরের আগমনকে কবি দুঃখ, দুর্দশার অবসান বলে মনে করেছেন। মহামিলনের কেন্দ্রবিন্দু 'মক্কা-মদিনা'র সঙ্গে ভারতের ব্যবধান বিস্তর। কিন্তু সব প্রতিকূলতার মধ্যেও কবি বাতাসের মধ্যে শুনতে পেয়েছেন ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান—

'ভেসে আসে সে উদাত্ত মন্দ্রিত নির্ঘোষ--

সাম্যের দিশারি আমি--আমি মুসলমান
দেশ-কাল-পাত্র মোর সর্ব একাকার--
বহুত্বে একক আমি
আত্মার আত্মীয় মোর দুনিয়া-জাহান!'[২৬] (ঈদ-উল-ফিত্‌র)

শাহাদাৎ হোসেনের দ্বিতীয় ধারার কবিতায় বর্ণিত হয়েছে ইসলামের অতীত ঐতিহ্য, ইতিহাস ও গৌরবগাথার কথা। এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল—'মহাপয়গাম', 'ঈদবোধন', 'কঙ্কাল', 'ইয়ারমুক', 'নূরজাহান', 'শাহাজাহানের প্রতি', 'মরু সঞ্জীবনী', 'যুগের দণ্ডী' প্রভৃতি। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'মহাপয়গাম' কবিতাটি। আল্লাহ্ যে এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর ঊর্দ্ধে আর কেউ নেই সে-কথাই আলোচ্য কবিতায় পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি—

'মরুদিগন্ত গিরিকন্দর ধ্বনি ওঠে বার-বার
সত্য মহান একক আল্লা, এ-তিন ভুবনে আর
নহে পূজনীয়, নহে বরণীয়, নহে কেহ মহীয়ান--
তিমির যুগের প্রভাবে আজিকে আসিয়াছে ফরমান।'[২৭] (মহাপয়গাম)

অতীতের বিভিন্ন ঘটনায় কবি লক্ষ করেছেন, মুসলমান সমাজ ত্যাগ ও ধর্মে বলীয়ান ছিল, যারা সত্য ও ন্যায়ের জন্য নিজের জীবন আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত। মুসলমানদের এই অতীত ঐতিহ্য যেন আজ কিছুটা ম্লান। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে মুসলমান সমাজ আজ বিপর্যস্ত। এই পরিবেশ থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কবির আশা একমাত্র তরুণ প্রজন্ম নিজেদের বুকের রক্তের বিনিময়ে অত্যাচারহীন এক আদর্শ মুসলমান সমাজ গঠন করবে। রক্তের বিনিময়েই পাওয়া সম্ভব হবে নতুন জীবন। তাই কবির অঙ্গীকার—

'ত্যাগ-পন্থী-'ইস্মাইল' সবুজ তরুণ
নব জীবনের আশে রঙিন অরুণ
যুগে যুগে এ আহ্বানে জেগেছিস তোরা
আজিও জাগর যুগে খুলে দেরে শোণিতের উন্মাদিনী ঝোরা।

তাজা খুনে লালে লাল হয়ে যাক মীনার ময়দান

মরণের আলিঙ্গণে হোক পুন জীবনের নব অভ্যুত্থান।'[২৮] (ঈদ-বোধন)

কয়েকটি কবিতায় কবি মুসলমানদের অতীত বীরত্বের কাহিনি গৌরবের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কবির আশা অতীতের এই ঘটনা বর্তমান যুগের মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁরাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হবেন। এরকমই একটি ঘটনা হল ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি খালেদের বীরত্বের কাহিনি। মুসলিম সেনানায়ক খালেদ ইয়ারমুক নদীর তীরে রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে কবি রচনা করেছেন 'ইয়ারমুক' কবিতাটি। যেখানে বিজয়ী সেনাপতি খালেদের বীরত্বগাথা বর্ণনায় কবি আবেগে আপ্লুত। তিনি প্রার্থনা করেছেন যুগে যুগে যেন খালেদের মতো সেনানায়ক মুসলমান সমাজে জন্ম নেয়। কিন্তু একই সঙ্গে কবি লক্ষ করেছেন সে-দিনের পরাজিত সেই ইউরোপীয় বাহিনী আজ সারা বিশ্বে কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। এমনকি ভারতও আজ পরাধীন। তাই তীব্র হতাশার মধ্যে দিয়ে কবি কবিতাটির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন যেখানে ধরা পড়েছে কেবলই হাহাকার—

'যুগান্ত সন্ধ্যায়--

সে-খালেদ আজি হায়!

কঙ্কালসার প্রেতের মূর্তি জঞ্জালে ঢাকে মুখ,

ভুলেছে সে আজ রক্ত-স্মৃতির তীর্থ ইয়ারমুক

হায়! নসীবের একি ফের

কুত্তা বনিল শের!'[২৯] (ইয়ারমুক)

ব্যক্তিগত জীবনে কবির এই ইসলাম-কেন্দ্রিক ধর্মচিন্তা তাঁকে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছিল তা বোঝা যায় তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি থেকে যেগুলি প্রায় সবই ইসলাম-কেন্দ্রিক। তবে তিনি একটি বিশেষ ধর্মের অনুরাগী হলেও তাঁর ধর্ম ভাবনায় কিন্তু কোনও যুক্তিহীন গোঁড়ামি ছিল না। অন্য ধর্মের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি মনে করতেন সহিষ্ণুতাই ইসলামের মূলমন্ত্র। তাঁর এই ভাবনার সমর্থন পাওয়া

যায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ‘সওগাত’ পত্রিকার জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। যেখানে তিনি বলেছেন—“অন্য জাতির মধ্য সৎ ও সুন্দর যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় সাগ্রহে বরণ করিয়া লওয়াও ইসলামের আন্তরিক শ্রদ্ধার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত মোহাম্মদ বলিয়া গিয়াছেন, যাহা পবিত্র তাহাকে গ্রহণ করো এবং যাহা অপবিত্র তাহাকে বর্জন করো।”[৩০] তবে অন্যান্য কবির মত শাহাদাৎ হোসেনও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘটনায় যথেষ্ট উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তাঁর তৃতীয় ধারার কবিতায় রয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের কথা। ‘তসলিম’, ‘স্বাগতম’, ‘জিন্দাবাদ’, ‘জিন্দা পাকিস্তান’, ‘হে পাক পাকিস্তান’ প্রভৃতি এই ধারার কবিতা। ‘হে পাক পাকিস্তান’ কবিতায় সিন্ধুনদের কলধ্বনিতে তিনি শুনতে পেয়েছেন নবরাষ্ট্র পাকিস্তানের মন্দ্রধ্বনি—

‘আরবী-দরিয়া বহিয়া এনেছে আরবের মরুবালি
কণিকা-কণায় মিশে আছে যার আজাদীর খুনলালী
আখেরী নবীর কদম-পাকের ধূলির নিছনি লোয়ে
সাত শহীদের কোরবানী-রাঙা মীনার স্মরণী বোয়ে
তুঙ্গ তুফানে অতলোত্তাল শতেক যোজন বাহি’
প্রাচী’র বেলায় গড়িল নবীন অপরূপ নওশাহী।
চকিত চমকে বিশ্ব নেহারে--এ কোন্ পাকিস্তান।
মন্দ্র গরজে ধ্বনিল সিন্ধু-আজাদ পাকিস্তান।’[৩১] (হে পাক পাকিস্তান)

শাহাদাৎ হোসেনের শিল্পীসত্তার স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে পাকিস্তান আন্দোলনকেই তিনি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু করে তোলেননি। কবিতার শিল্পগুণের প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। সাম্প্রদায়িকতা তাঁর চিত্তকে কেবল একটি খাতে প্রবাহিত করতে পারেনি। প্রেম-প্রকৃতি-ইসলামের যৌথ বন্ধনে তৈরি হয়েছে তাঁর কবিতার জগৎ। তবে সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁর ধর্মীয় আবেগ। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক আব্দুর রব যথার্থই বলেছেন—“আমাদের পূর্বসূরী যেসব কবি-সাহিত্যিক বাঙালি মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি সত্তাকে নির্মাণ করেছেন, কবি শাহাদাৎ হোসেন তাদের অন্যতম।”[৩২] তবে শাহাদাৎ হোসেনের কবিতায় ধর্মীয় আবেগের উপলব্ধি যেমন সমুজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট তেমনই

তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক অভিঘাতের দিকটিকেও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। কারণ তাঁর কবিতার অনেকটা অংশেই বক্তব্য এবং ভাবাবেগের অবলম্বন হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্রভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাব। এই রাষ্ট্রসম্ভাবনা তাঁর কবিমানসের সৃষ্টি উৎস অনেকটাই খুলে দিয়েছিল।

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪)

বাংলা কাব্যধারায় পাকিস্তান আন্দোলন যে-সমস্ত কবিদের কাব্য-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি গোলাম মোস্তফা। মুসলিম ঐতিহ্য ও ধর্ম বিশ্বাসকে তিনি তাঁর কাব্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁর কাব্য-ভাবনার মূল সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে মুসলিম ঐতিহ্য ও অতীত কীর্তিকে অবলম্বন করেই। সৈয়দ আলী আহসানের মতে—"একটি জাতি ও সমাজের ধর্মগত একটি সহজ বিশ্বাসকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তত্ত্ব, উপদেশ এবং ইতিহাসের মধ্যে।"[৩৩] ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্যসূচক কবিতার সঙ্গে তিনি মুসলমানদের পুনর্জাগরণ এবং মুসলিম ঐতিহ্য বিষয়ক কবিতাও লিখেছেন প্রচুর। যেখানে কেবল মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য নয়, বর্তমান যুগের হতাশাও প্রতিফলিত হয়েছে। একই সঙ্গে রয়েছে হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার আশা। গোলাম মোস্তফার কাব্যগ্রন্থগুলি হল—'রক্তরাগ' (১৯২৪), 'হাস্নাহেনা' (১৯২৭), 'খোশরোজ' (১৯২৯), 'কাব্য কাহিনী' (১৯৩২), 'সাহারা' (১৯৩৬), 'মুসাদ্দাম-ই-আলী' (১৯৪১), 'তারানা-ই-পাকিস্তান' (১৯৪৮), 'বুলবুলিস্তান' (১৯৪৯), 'আল-কুরআন' (১৯৫৭), 'কালামে ইকবাল' (১৯৫৭), 'বনি আদম' (১৯৫৮), 'শিকওয়া ও জনাব-ই-শিকওয়া' (১৯৬০)।

পাকিস্তান-পূর্বযুগে গোলাম মোস্তফার কাব্য-ভাবনায় প্রধানত দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। একদিকে রয়েছে প্রেমচেতনা, অন্যদিকে আছে পাকিস্তান ভাবনা ও ইসলামের পুনর্জাগরণ। দুটি ধারাকে তিনি তাঁর কবিতায় সমান্তরাল রূপ দিতে চাইলেও সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁর ইসলামি চেতনা। গোলাম মোস্তফার কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু হল মুসলমান জাতির জয় ও অগ্রগতি কামনা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'রক্তরাগ' কাব্যের প্রথম কবিতা 'পরিচয়'। আলোচ্য কবিতায় কবি মুসলমান জাতির অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটাতে চেয়েছেন। একদা যে অবহেলিত মুসলমান জাতি আরবভূমিতে উপেক্ষার শিকার হয়েছে আজ তারা নতুনমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সারা পৃথিবীতে বিরাজমান। শান্তির বাণী তাদের হৃদয়ের দাবানলকে নিবিয়ে আজ তাদের করে তুলেছে বিশ্বপ্রেমিক। পরাধীন

জাতির পরিচয় মুছে ফেলে আজ তারা বিজয়ী তক্‌মা পেয়েছে। তাদের সেই অতীত ইতিহাসকে গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে কবি বলেছেন—

‘রোম ও গ্রীসের বিজয়-দর্প খর্ব করিয়া যারা
নিখিল ধরার ইতিহাস মাঝে বহালো নতুন ধারা,
এশিয়ার কোন রাজ-অধিরাজ পারেনি সাধিতে তাহা-
বিজয় করিয়া য়ুরোপ প্রথমে লভিল যাহারা মান,
প্রাচ্য গর্ব হে জগদ্বাসি,-আমরা মুসলমান।’[৩৪] (পরিচয়)

মুসলমান ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ আরবের ভূমিতে। কিন্তু ধর্মীয় আবেগে শুষ্ক, তরুহীন মরুভূমি কবির কাছে শ্যাম-সরসা। নিদারুণ দুর্দিনে আরব ভূমিতে ইসলামের যে মূলমন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল আজ তা সারা বিশ্বে রণিত। মিথ্যার অভিযানের মধ্যেও সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছে এই আরবের মাটিতে। আরবকে কুর্নিশ করে কবি তাই জানালেন—

‘আল্লার পূতবাণী লভিয়াছো তুমি রাণি,
মহিমায় ভরা তব বক্ষ,
লভিয়াছো মহানবী, অনুপম যার ছবি,-
যাঁর সাথে মানুষের সখ্য,
কোটি কোটি মানবের লভিতেছো ভক্তি,
তব পরে সকলেরি প্রেম-অনুরক্তি,
নিখিলের মানবের মিলনের স্থান তুমি,
সকলের নয়নের লক্ষ্য!’[৩৫] (ঐ)

নান্দনিক বিচারে কবিতাটি শেষপর্যন্ত শিল্পগুণ অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি। আরবকে কেন্দ্র করে কবির ভাবনা বিকশিত হলেও আবেগের আতিশয্য এবং অযাচিত ধর্মের গুণগান কবিতাটির শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন করেছে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘খোশরোজ’ কাব্যের কবিতাগুলিতে মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যকে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি রয়েছে হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার আশা। বর্তমান সমাজে মুসলমানরা নানা কারণে পিছিয়ে পড়েছেন, তাঁরা ভীত, সন্ত্রস্ত। তাই কবির জিজ্ঞাসা—

'ওরে মুসলিম! ভীরু! কাপুরুষ! ভয় কেন আজি করিস মনে?
কিসের শঙ্কা? ছুটে চল আজি মুক্তি-আহবে জীবন রণে
আঘাত দেখিয়া ভয় কেন তোর? কম্পিত কেন হৃদয়খানি?
ভুলে গেলি কিরে অতীতের সেই মরণ-হরণ জীবন-বাণী?'[৩৬] (মুসলিম)

কিন্তু কবি জানেন এই মুসলমানরা একসময় বিশেষ শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন। তাই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে নতুন উদ্যমে তিনি মুসলমান সমাজকে এগিয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন, স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন তাদের অতীত গৌরবকে—

'দৃপ্ত গর্বে জেগে ওঠ্ তবে বাধা-বন্ধন দু'পায়ে দলি
আঘাত সহিয়া বাঁধন কাটিয়া চলারেই মোরা জীবন বলি।
ন'স্ ন'স্ তুই ছোটো ন'স্--তুই হীন ন'স্--তোর বিরাট খ্যাতি,
মুসলিম তুই- বিশ্বাস কর্- জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ জাতি।'[৩৭] (ঐ)

গোলাম মোস্তফার কবি-প্রতিভা মূলত ইসলামি আদর্শকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে বলেই সারা বিশ্বের মুসলিম ঐতিহ্য, আদর্শ এবং সাফল্যকে তিনি আপন সাফল্য কল্পনা করে উৎসাহিত হয়েছেন। 'রীফ শরীফ' কবিতায় দেখা যায় কবি আফ্রিকার কাফ্রী আয়কের বিজয় সাফল্যকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করে বাঙালি মুসলমানদের নবচেতনায় জাগাতে চেয়েছেন—

'জাগো বাংলার মুসলিম জাগো,
ঘরে ঘরে আজি জাগাও দীপ,
জেগেছে ওই যে মরু-মোরক্কে নবীন রীফ!
তের-শো বছর আগেকার দিন এসেছে ফের,
সাহারা-আরবে বেজেছে দামামা ইস্‌লামের,
জ্বালো দ্বীপ-জ্বালো দ্বীপ,
নবীন মন্ত্রে জাগ্রত নব রীফ্ আজি যে গো
''রীফ্ শরীফ্!'''[৩৮] (রীফ্-শরিফ)

নতুন প্রজন্মের আহ্বান কবি শুনতে পান, কল্পনায় মুসলমানদের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থানে দেখতে চান এবং ভবিষ্যৎ সফলতার ইঙ্গিত লক্ষ করেন তার মধ্যে। আসলে ইসলাম ধর্মের ধারণার মধ্যে নিখিল বিশ্ব ইসলামীয় সৌহার্দ্যবোধের যে উপলব্ধি প্রথমাবধি আছে সেখানে দেখা যায় এই ধর্মের বন্ধনে কাছাকাছি এসেছেন বিশ্বের যেকোনো দেশের যেকোনো ভাষার মানুষ। তাঁদের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে সৌহার্দ্যের নৈকট্য। এই 'প্যান-ইসলামিজম্' অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব ইসলামীয় সৌহার্দ্যের শক্তিতেই একটা সময় ইসলামীয় সাম্রাজ্য এশিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকার অনেকটা অংশে অধিকার বিস্তার করতে পেরেছে।

গোলাম মোস্তফার 'তারানা-ই-পাকিস্তান' কাব্যটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলি রচিত হয়েছে পাকিস্তান গঠনের প্রাক্‌পর্বে, যার কেন্দ্রে রয়েছে পাকিস্তান আন্দোলন। এতে ইসলামি গজল, পাকিস্তানি গান ও বিবিধ---এই তিন ধরনের গান সংকলিত হয়েছে। এইসব গানগুলি তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'পাকিস্তানী গান' পর্যায়ে মোট পনেরোটি গান সংকলিত হয়েছে। নবরাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির আনন্দ এই পর্যায়ের গানগুলিতে লক্ষ করা যায়। কবি লক্ষ করেছেন পৃথিবীর সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত। সেখানে যেমন কোনও ন্যায় নেই, তেমনি নেই যথেষ্ট সম্মান। তাঁর মতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। কবিতার মাধ্যমে সেই বার্তা দিতে গিয়ে কবি তাই বললেন—

'দুনিয়াতে আজ যুলমাৎ ভারী, নাই কো ইনসাফ, নাই ঈমান,
কে শুনাবে প্রেমের বাণী, করবে কে মুশকিল আসান
কে মিলাবে আরব-আজম পূরব-পশ্চিম সারা জাহান
এককথায় তার সাফ জবাব দাও--
--পাকিস্তান সে পাকিস্তান।।'[৩৯] (পাকিস্তানী গান)

কবি সবক্ষেত্রেই তাঁর কাব্যে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচারীর সঙ্গে সংগ্রাম ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন। আর এসব ক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ হিসাবে মুসলমান সমাজের বিভিন্ন কাহিনিকে গ্রহণ করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই, ইসলামের অতীত ঐতিহ্যকে সমাজের সামনে উপস্থাপন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা।

কিন্তু ইসলামি অনুষঙ্গের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে তাঁর কবিতাগুলি অনেকক্ষেত্রে ইসলামের নীরস প্রচারপত্র হয়ে উঠেছে মাত্র। এখানেই তাঁর কবিত্ব শক্তির সীমাবদ্ধতা।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

মুসলিম রেনেসাঁস ও জাতীয় জাগরণের কবি ফররুখ আহমদ। অবিভক্ত ভারতবর্ষে যখন নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ কবি স্বতন্ত্র সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং নিজেদের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আদর্শকে সাহিত্যে রূপদান করতে সচেষ্ট হন, ফররুখ আহমদও সেই ইসলামি আদর্শভিত্তিক সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের অন্যতম কবি যিনি মুক্তকণ্ঠে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বন্দনাগান গেয়েছেন। কাব্যসাধনায় কবি ইকবালের আদর্শকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন তিনি। কবি ইকবাল মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তাতে অনেক মুসলিম কবিই অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মভিত্তিক কাব্যসাধনায় নিমগ্ন হন। ফররুখও তেমনই একজন কবি যিনি ইকবালের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ। তবে ইকবাল মুসলিমদের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব প্রেক্ষাপটকে সম্যক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের একটি পথ নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে ফররুখ কেবলই মুসলিম সম্প্রদায়ের অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিতে বিচরণ করেছেন, বর্তমান বাস্তবের দিকে তেমনভাবে আলোকপাত করেননি। এ-প্রসঙ্গে মধুসূদন চক্রবর্তী বলেছেন— ‘‘ফররুখ আহমদের চরমতম ব্যর্থতা এখানেই। অতীত স্বপ্নেই মশগুল হয়ে রয়েছেন তিনি। বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্র রচনায় তাঁর আগ্রহ তেমন, ততটা নেই।’’[৪০]

ফররুখ আহমদের কাছে পরম মূল্যবান হল ইসলামের আদর্শ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের আশা। এই যুগ্মধারাকে একত্রিত করে নিজের কাব্যপ্রবাহকে একটা নতুন মাত্রা দান করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ফররুখ। এই কারণে সমসাময়িক জীবন ও সমাজচেতনার পরিবর্তে ইসলামি ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করেই তার কবিপ্রতিভা বিকশিত হয়েছে। তবে তাঁর কাব্যে মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে অধঃপতিত মুসলমান জাতির দুর্দশার কথা। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছয়টি—‘সাত সাগরের মাঝি’ (১৯৪৪), ‘আজাদ করো পাকিস্তান’ (১৯৪৬),

'সিরাজাম মুনীরা' (১৯৫২), 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১), 'মুহূর্তের কবিতা' (১৯৬৩), 'হাতেম তায়ী' (১৯৬৬)।

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যেই ফররুখ আহমদের চিন্তাধারার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। এই কাব্যের 'সিন্দবাদ', 'বার দরিয়ায়', 'পাঞ্জেরী', 'তুফান', 'নিশান' প্রভৃতি কবিতায় একদিকে যেমন মুসলমান সম্প্রদায়ের অতীত ঐতিহ্যকে কবি গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করেছেন তেমনি বর্তমান দুর্দশাকেও তুলে ধরেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরাধীন জাতিকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা। উল্লেখ করা যায় 'সিন্দবাদ' কবিতার কথা। কবি এখানে আশাবাদী। কবি লক্ষ করেছেন বর্তমান জীবন নানা প্রতিকূলতায় বিঘ্নিত, মুসলমান সমাজ তার অতীত ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে বিলাস-বৈভবে নিমগ্ন। পরাধীনতার গ্লানিও তাদের মনে বেদনা জাগাতে পারছে না। জীবনের এই অবক্ষয়, উদাসীনতার গ্লানি কবিচিত্তকে ব্যথিত করেছে। আলোচ্য কবিতার ছত্রে ছত্রে সেই বেদনার রূপায়ণ ঘটেছে। কিন্তু আশাবাদী কবি নবজীবনের আহ্বান শুনতে পান। পাকিস্তান আন্দোলনই কবিকে আশাবাদী করেছে। সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মুসলমান সমাজ এক আলোক উজ্জ্বল সমাজের সন্ধান পাবে বলেই কবির বিশ্বাস। সেই কাঙ্ক্ষিত সম্ভাবনাময় সকালে উপনীত হওয়ার জন্য কবির সুতীব্র আহ্বান—

> 'ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
> দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ,
> ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
> নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ!'[৪১] (সিন্দবাদ)

আরব্য উপন্যাসের নায়ক সিন্দবাদ এই নবসৃজনে মুসলমান সমাজের পথ প্রদর্শক। গৃহের মায়া-মমতা ত্যাগ করে কবি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। মিলিত প্রতিরোধ যেকোনও বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। সে-জন্য কবি মুসলমান সমাজে সিন্দবাদের মত দক্ষ মাঝির আগমন প্রার্থনা করেছেন। কবি জানেন সিন্দবাদের মত মাঝিই পারে মুসলমান সমাজকে দুর্যোগের রাত্রি থেকে আলোকোজ্জ্বল সকালে পৌঁছে দিতে।

স্বীয় সম্প্রদায়ের দুর্দশা কবিকে প্রতিনিয়ত ব্যথিত করেছে। কবি চেয়েছেন এই দুর্যোগের রাত্রি যেন দ্রুত অবসিত হয়। দুর্দশা থেকে উত্তরণের এই আকুলতা ফুটে উঠেছে 'পাঞ্জেরী' কবিতায়—

'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
কোন্ দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা প'ড়েছি এসে?'[৪২] (পাঞ্জেরী)

কবিতাটি একটি রূপক কবিতা। 'পাঞ্জেরী' শব্দের আভিধানিক অর্থ নৌকা বা জাহাজের অগ্রভাগে অবস্থিত পথনির্দেশক আলোকবর্তিকা। আলোচ্য কবিতায় মুসলমান সম্প্রদায়ের কর্ণধারকে পাঞ্জেরীর প্রতীকে তুলে ধরা হয়েছে। কবিতাটিতে সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে কবি জাতীয় নেতৃত্বের সচেতনতা, দৃঢ়তা প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ও বর্তমান নেতাদের অদূরদর্শিতার জন্য মুসলমান সমাজ অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ। এই পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে কবি পাঞ্জেরীকে আহ্বান জানিয়েছেন।

কবির পাকিস্তান ভাবনা আরও সুদৃঢ় রূপ লাভ করেছে 'আজাদ করো পাকিস্তান' সংকলনের কবিতাগুলিতে। কাব্যগ্রন্থটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করলে নতুন রাষ্ট্র গঠনের আশায় কবি উন্মুখ হয়ে ওঠেন। আলোচ্য সংকলনের কবিতাগুলিতে রয়েছে কবির সেই দেশ গঠনের আনন্দ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। এই সংকলনের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি হল—'আজাদ করো পাকিস্তান', 'ওড়াও ঝাণ্ডা', 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' প্রভৃতি। পাকিস্তান গঠিত হলে একটি আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন করা যাবে বলেই কবির দৃঢ় বিশ্বাস। যে সমাজে শাসক নয়, নিপীড়িত জনগণই শেষ কথা বলবে। অত্যাচারীর পতন হবে এবং সেই অত্যাচারমুক্ত সমাজে জনগণই নতুন সকাল নিয়ে হাজির হবে। আর এসব কিছুর পিছনে রয়েছে মুসলিম লীগের অবদান। তাই তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে কবি বলেছেন—

'আজ মুসলিম জনতা-সাগর
উত্তাল-তার উঠেছে চাঁদ
লক্ষ কণ্ঠ ধ্বনিত আকাশে;
মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ
কায়েদে-আজম জিন্দাবাদ।।'[৪৩] (কায়েদে-আজম-জিন্দাবাদ)

ফররুখ আহমদের পাকিস্তান ভাবনার যে আভাস 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের কবিতাগুলিতে প্রকাশিত তার একটা স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায় 'আজাদ করো পাকিস্তান' সংকলনের কবিতাগুলিতে। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে কবি বিভোর। দীর্ঘদিনের অত্যাচারের শেষে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হলে পূর্ব-বাংলার মুসলমান সমাজ এক নতুন রাষ্ট্র লাভ করবে। আর এই নবরাষ্ট্র গঠনের রূপকার হিসাবে কবি মুসলীম লিগ ও মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র নামে জয়ধ্বনি করেছেন। কাব্যচেতনায় শৈল্পিক দিকের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট ধর্মভিত্তিক আদর্শ প্রচারের উপায় হিসাবেই তিনি তাঁর কবিত্ব শক্তিকে নিয়াজিত করেছেন। যেখানে শুধুই রয়েছে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনে কবির ব্যক্তিগত আনন্দ-অনুভূতি ও আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক সাঈদ-উর রহমানের উক্তি স্মরণযোগ্য—"বর্তমানের হতদশা থেকে মুক্তিলাভের জন্য মুসলমানদিগকে শুধু ইসলামে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়ে কবি সন্তুষ্ট থাকেননি, একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণের দ্বারাও একটি বিশেষ ভূখণ্ডের ভিত্তিতে কিভাবে নতুন জাতির বিকাশ হতে পারে, সে-সম্পর্কেও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন।"[৪৪]

তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯)

‘মাহেনও’ পত্রিকার সম্পাদক তালিম হোসেন ইসলামি রেনেসাঁর কবি। পূর্ব-বাংলার পাকিস্তান আন্দোলন যখন তীব্রতর সেই সময় থেকেই তালিম হোসেন সাহিত্য সাধনায় মগ্ন। ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ গৃহীত হওয়ার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সমর্থনে অনেক মুসলমান কবি কবিতা লিখেছেন। তালিম হোসেনও তার ব্যতিক্রম নন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে কবি তাঁর কবিতায় রূপদান করেছেন। তালিম হোসেনের কাব্যগ্রন্থগুলি হল—‘দিশারী’ (১৯৫৬), ‘শাহীন’ (১৯৬২), ‘নূহের জাহাজ’ (১৯৮৪)। এর মধ্যে দিশারীতে স্থান পেয়েছে পাকিস্তান আন্দোলনকালে রচিত কবিতাগুলি। এ-সম্পর্কে সাঈদ-উর রহমান ‘দিশারী’ কাব্যের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে তালিম হোসেন বলেছিলেন—“একালে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের যে বিভিন্ন ধারা পাকিস্তানের স্বপ্নে এসে সুসংহত রূপ পেয়েছিল, তার বাস্তব রূপায়ণের পথে প্রেরণা ও উদ্দীপনার সাথে এক অকুণ্ঠ আত্মানুসন্ধানের স্বাক্ষর বিধৃত রয়েছে এই লেখাগুলোতে।”[৪৫] ‘দিশারী’ মূলত পাকিস্তান ও ইসলাম বিষয়ক কবিতার সংকলন। এই সংকলনের প্রথম কবিতা ‘দিশা’। আলোচ্য কবিতায় কবি মুসলমান সমাজকে এক নতুন আলোকপথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন—

‘শতকের নিশি-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে
সন্ধানী দীপ আমার জোহরা তারা
কোথায় কখন নীহারিকা পথে ফিরে
সুপ্তির ক্ষণে অলক্ষ্যে হ’লো হারা।
সেই তারা-দীপ জ্বালব আবার আমি--
এখানে আমার কাফেলা যাবে না থামি।’[৪৬] (দিশা)

কবির মতে দীর্ঘকাল ধরে মুসলমান সমাজ নানা প্রতিকূলতার কারণে পিছিয়ে পড়েছে। বিপর্যস্ত মুসলমান সমাজের ভবিষ্যৎ যেন নীহারিকা পথের মতো কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কবির ‘জোহরা তারাও’ ভবিষ্যতের দিশা ঠিক করতে না পেরে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু আশাবাদী কবির দৃঢ় প্রত্যয় তিনি পুনরায় নতুন পথ নির্দেশে সক্ষম

হবেন। কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়, শাস্ত্র নির্দেশিত পথ অবলম্বন করলেও মুসলমানদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবে এবং শোষণমুক্ত নতুন সমাজ গঠন সম্ভব হবে বলেই মনে করেন কবি—

'জিন্দেগানীর আজাদী-সনদ
এনেছি আল-কোরান,
এনেছি দিশারী আল-আমীনের
তওহিদী ফরমান।'[৪৭] (ঐ)

কবি যেন ঈশ্বরের দূত হিসাবে মুসলমান সমাজের কাছে নতুন রাষ্ট্র গঠনের বার্তা নিয়ে এসেছেন। কবি মনে করেন কোরাণের বাণী মেনে চললেই মুসলমান সমাজ স্বাধীন হবে। কবি লক্ষ করছেন যে অবিভক্ত ভারতে মুসলমানরা যথাযোগ্য সম্মান পাচ্ছেন না। আলাদা রাষ্ট্রেই তাঁদের উন্নতি সম্ভব। নবরাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলেই মুসলমানরা তাঁদের হৃত সম্মান ফিরে পাবেন। এছাড়া তাঁদের সামনে অন্য পথ খোলা নেই। সে-কথা উল্লেখ করে কবি বলেছেন—

'চল্লিশকোটি বাসিন্দার এই মহাভারত
ফিরে চাহে আজ সিন্ধুপারের সে দাসখৎ-
দশকোটি তার মুসলিম চাহে পাকিস্তান
বলে-আমাদের আজাদীর নাহি অন্য পথ।
জিঞ্জীর ছেঁড়া উৎসবে
রক্তে যে পাপ শোধ হবে
হিঁদুস্তানের হিন্দুরাজের জিন্দানে পশি পুনর্বার
পরবো না সেই পাপ জিঞ্জীর--শপথ মোদের শির সবার!'[৪৮] (পাকিস্তান)

এ-প্রসঙ্গে বলা যায় 'নয়া জিন্দেগী', 'পাকিস্তান আজাদ', 'দিল আজাদীর দেশ', 'পাক ওয়াতন' প্রভৃতি কবিতার কথা। সবক্ষেত্রেই কবি মুসলমান জাতির উন্নতির জন্য পাকিস্তান গঠনকেই একমাত্র বিকল্প পথ মনে করেছেন। কারণ কবি সক্রিয়ভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফররুখ আহমদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে

ফররুখ ছিলেন অতীতচারী। তিনি কল্পনা করেছিলেন ইসলামের পুনর্জাগরণ। তালিম হোসেন সেখানে বাস্তব সচেতন এক কবি। 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রই তাঁর একমাত্র কাম্য। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক শহীদ ইকবাল বলেছেন—''মুসলমান ও ইসলাম ধর্মের ভেতর দিয়ে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ার আখ্যান রচনা করেন কবি। এজন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি প্রেরণা হিসাবে গৃহীত হয় কাব্যে।''[৪৯]

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

ইসলামি ভাবধারার কাব্যসাধনার মধ্যে দিয়ে সৈয়দ আলী আহসানের কাব্যজগতে পদার্পণ। মূলত ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী সময়েই তাঁর কাব্যে এই ধরনের পাকিস্তান-ভাবনার বিকাশ ঘটে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। এই সংসদের সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই সময় তিনি মুসলমান কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠেন। 'ফজলুল হক' হলে সংসদ প্রতিষ্ঠার দিন আয়োজিত সভায় তিনি হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির প্রকৃতিগত ভিন্নতা প্রসঙ্গে বলেন যে, মুসলমানদের সাহিত্য, ঐতিহ্য থেকে পৃথক হওয়া উচিত তা নয়, তাদের সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠা উচিত নিজ সমাজ ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে। এই সভায় তিনি তিনটি আদর্শকে সামনে রেখে সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলেছিলেন। প্রথমত, ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্যবোধ থেকে উপাদান আহরণ; দ্বিতীয়ত, অধুনা অপাংক্তেয় মুসলমানি পুথিকে পরিমার্জিত করে শালীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা; এবং তৃতীয়ত, পূর্ব-পাকিস্তানের অস্বীকৃত গ্রাম্যজীবনকে আরও বেশি করে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা। তবে ইসলামি তমদ্দুনই (কৃষ্টি বা সংস্কৃতি) ছিল সৈয়দ আলী আহসানের লক্ষ্য। তিনি বলেছিলেন—"পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য ইসলামি তমদ্দুনের বাহন হবে।"[৫০]

সৈয়দ আলী আহসানের সমাজ-সচেতন বিষয়ক কবিতাগুলি পাকিস্তান-আন্দোলনকালে রচিত। সমসাময়িক অন্যান্য মুসলমান কবির মত তিনিও মুসলমানদের ঐতিহ্য ও দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। এই সময়ে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছিলেন সেখানে মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান আদর্শহীনতা সমান্তরাল স্থান লাভ করেছে। কবির প্রথম কবিতা 'মক্কা মোয়াজ্জমার পথে' ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যকে বাস্তবের মাটিতে পর্যালোচনা করে তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করাই ছিল কবির লক্ষ্য—

'বহু প্রদেশের বহু মাটি পার হয়ে
তমোময় কত মৃত্যু নিশার নিশ্বাস সয়ে সয়ে

রৌদ্রদগ্ধ দিনের প্রদাহ লয়ে
পার হয়ে কত বালুকার প্রান্তর,
কাফেলার পথে মদির স্বপ্নে জাগে প্রশান্ত সুর;
আল্লাহ আকবর
আল্লাহ আকবর।'[৫১] (মক্কা মোয়াজ্জমার পথে)

আলোচ্য কবিতায় 'কাফেলা' বলতে কবি মুসলমান সমাজকে নির্দেশ করেছেন। অতীতে এই কাফেলার যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজও সেই যাত্রা অব্যহত রয়েছে। যে আরবভূমি থেকে মুসলমানরা নানা বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ করে তাঁদের জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা এখন চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে। চোখে তাঁদের নব জীবনের স্বপ্ন। এ-স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য তাঁরা শত লাঞ্ছনা, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন। 'রৌদ্রদগ্ধ দিন' এবং 'বালুকার প্রান্তর' শব্দবন্ধ দুটিকে কবি প্রতিবন্ধকতার সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কবির বিশ্বাস সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে মুসলমান সমাজ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে। তাই তিনি বললেন—

'বিশ্রামহীন প্রহরে আকাশে যে পাখী উড়িয়াছিল
মনের কোণায় এনেছিলো সংবাদ—
মৃত্যু উড়ায়ে পাখার ঝাপটে সংঘাত এনেছিলো
আজ আনিয়াছে প্রাণের রেণুতে সমুদ্র আস্বাদ।'[৫২] (আমন্ত্রণ)

বর্তমান থেকে অতীতে ফিরে যাওয়া এবং অতীত থেকে পুনরায় বর্তমানে ফিরে আসা সৈয়দ আলী আহসানের কবি স্বভাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই অতীত গৌরবকে তিনি স্মরণ করলেও বর্তমানের দুরবস্থার কথা তিনি বিস্মৃত হননি। সে-জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে দৃপ্তভঙ্গিতে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কবি—

'মিনার মাটিতে পড়েছে অনেক খিমা
মিনার মাটিতে আল হেলালের দিন
সুরখির রঙ্গে মাটিতে আলোক জ্বলে
আল্লাহ্‌র রাহে কোরবানি দাও-তুলে নাও সঙ্গীন

সঙ্গীন কাঁপে-দীপ্তিতে তার অরুণোদয়
তিমিরদীর্ণ সূর্যহীরক আনে অভয়।'[৫৩] (ঐ)

ভারত বিভক্ত হয়ে নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হওয়ায় কবি আনন্দিত হয়েছিলেন। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যে যাত্রার কথা কবি বারবার কবিতায় বলেছেন তা যেন একটা নির্দিষ্ট পরিণতি পেয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টিতে। কবি বিশ্বাস করেন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে শঙ্কাহীন, শোষণমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হবে। সে-জন্য তিনি বললেন—

'এসেছে নতুন দিন,
ভয় নাই আর, আলোক উঠেছে হাসি,
গভীর তিমির বেদনায় পড়ে ঢুলে।
ভয় নাই আর ভয় নাই,
শংকাহরণ, অভয়মন্ত্র, শোন শোন কান পাতি।'[৫৪] (বেদনাবিহীন স্বপ্নের দিন)

যদিও এরপর পাকিস্তান-কেন্দ্রিক কবিতা লেখার উৎসাহ কবির কমে আসে। নির্দিষ্ট একটা সময়ের পরে নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা কবিতাগুলিকে তাঁর নিজের কাছে যথেষ্ট কাব্যরসাশ্রিত বলে মনে হয়নি। একথার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী কালে প্রকাশিত কবির কাব্যসমগ্র থেকে। যেখানে পাকিস্তান বিষয়ক কবিতাগুলিকে স্থান না দেওয়ার কারণ জানিয়ে কবি বলেছেন—"তাই সে সময়কার কবিতাগুলো আমি পরবর্তী পর্যায়ে গ্রহণ করিনি।....আমার বিচারে সেগুলো আমার কাব্য রচনার উন্মেষের সংবাদ বহন করে সত্য কিন্তু কোনো প্রকার কাব্যগত সিদ্ধির পরিচয় বহন করেনা।"[৫৫] যদিও সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। বিশ শতকের চারের দশকের অন্যান্য কবির মত পাকিস্তান আন্দোলন তাঁকেও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সেই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একাধিক কবিতা লিখেছিলেন যার মূলে সক্রিয় ছিল পাকিস্তান-চেতনা। কারণ 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' প্রতিষ্ঠার সময় তিনি একটি ইসলাম ধর্মের অতীত ঐতিহ্য তথা গৌরবকে

নীতিগতভাবে সমর্থন করেই সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলেছিলেন। সমালোচক সাঈর-উর রহমান এ-প্রসঙ্গে বলেছেন—''ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে তাঁর কবিতা রচনার প্রয়াস শুধু সাহিত্যগত নয়, আদর্শগতও বটে।''[৫৬]

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় পাকিস্তানি সাহিত্যচিন্তার মূল কথা হল নবরাষ্ট্র পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে একটি শোষণমুক্ত আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখা এবং সেই স্বপ্নকে কবিতায় রূপদান করা। কবি শাহাদাৎ হোসেন থেকে শুরু করে সৈয়দ আলী আহসান সকলেই একই রকম ভাবনাকে তাঁদের কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু পাকিস্তানপন্থী কবিদের কাব্যাদর্শ স্বাভাবিকভাবেই ছিল কিছুটা সীমাবদ্ধ। কারণ নতুন রাষ্ট্র গঠনের আনন্দ ও আবেগকে কেন্দ্র করে কবিতার যে কায়া নির্মিত হয়েছিল তাতে প্রধান হয়ে উঠেছিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের দাবি। কবিতার শৈল্পিক সত্য সেখানে অনেকটাই উপেক্ষিত হয়েছে। সেই জন্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত যত কবিতা লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই গুণগতমান অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান-কেন্দ্রিক চিন্তাধারা সাহিত্যকে ক্রমশ সংকীর্ণ করে তুলেছিল। এরই মধ্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল তা পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি। যা 'ভাষা-আন্দোলন' হিসাবেই সমধিক পরিচিত। এই আন্দোলন কেবল রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক চেতনা ও অধিকার অর্জনের পথকে প্রশস্ত করেনি, একই সঙ্গে সমকালীন বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বিশেষত কবিতায় আধুনিক ও প্রগতিবাদীধারার বিকাশ ঘটাতেও সাহায্য করেছিল।

সূত্রনির্দেশ:

১. বদরুদ্দীন উমর, 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৪১

২. মোঃ মকসুদুর রহমান, ''বঙ্গভঙ্গের কারণ'', 'বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালির ঐক্য?', প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রতীক প্রকাশ বইমেলা ২০১৪, পৃ. ৮

৩. কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, ''বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশ'', 'পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৪, পৃ. ১২

৪. তদেব, পৃ. ১৬

৫. বদরুদ্দীন উমর, 'বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ১৪

৬. আবুল মনসুর আহমদ, ''বেংগল প্যাক্ট'', 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ ৩ রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ৩৮

৭. আবুল মনসুর আহমদ, ''নির্বাচন-যুদ্ধ'', তদেব, পৃ. ৯৯

৮. কালীপদ বিশ্বাস, ''সাঁইত্রিশের নির্বাচন'', 'যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১২, পৃ. ৯

৯. কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, ''দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং পাকিস্তান আন্দোলন'', 'পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৪, পৃ. ৫২

১০. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.), ''বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাব, আজাদ হিন্দ ফোর্স, ভারত বিভাগের শেষ অধ্যায়, বাংলার রাজনীতির দশ বছর'', 'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ: প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ১৯৯৮, পৃ. ২৬

১১. বদরুদ্দীন উমর, ''মুসলিম জাতীয়তবাদ ও মুসলিম সংস্কৃতি'', 'পূর্ববাংলার সংস্কৃতির সংকট', জিয়াদ আলি (সম্পা.), নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, জুন ১৯৭১, পৃ. ৬৫

১২. আবুল হাশিম, ''প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দপ্তর ও পার্টি হাউস'', 'আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৪৮

১৩. আবুল হাশিম, ''সাধারণ নির্বাচন'', তদেব, পৃ. ৯০

১৪. বশীর আলহেলাল, ''রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট'', 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০০৩, পৃ. ৪৭

১৫. কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, ''দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং পাকিস্তান আন্দোলন'', 'পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৪, পৃ. ৭২

১৬. কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, ''স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশক'', তদেব, পৃ. ১৮২

১৭. আহ্‌মদ রফিক, ''চল্লিশের কবিতা'', 'বাংলাদেশের কবিতা দশকভাঙা বিচার', সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৪, পৃ. ৬১

১৮. হুমায়ুন আজাদ, ''পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবৃক্ষ'', 'ভাষা আন্দোলনের সাহিত্যিক পটভূমি', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১

১৯. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.), ''বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাব, আজাদ হিন্দ ফোর্স, ভারত বিভাগের শেষ অধ্যায়, বাংলার রাজনীতির দশ বছর'', 'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ: প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ১৯৯৮, পৃ. ২৬

২০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথমখণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ১৩

২১. সৌমিত্র শেখর, ''একাত্তর পূর্ববর্তী বাংলাদেশের বাংলা কবিতা'', 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', দুই বাংলার কবি ও কবিতা, তাপস ভৌমিক (সম্পা.), কলকাতা, শারদীয়া ২০১৫, পৃ. ১০২-১০৩

২২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ''শাহাদাৎ হোসেনের কবিতা'', 'শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা', আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০০২, পৃ. ২২৮

২৩. শাহাদাৎ হোসেন, ''হযরত মোহাম্মদ (সা)'', তদেব, পৃ. ১১৩

২৪. শাহাদাৎ হোসেন, ''রমজান'', তদেব পৃ. ৫০

২৫. তদেব, পৃ. ৫১

২৬. শাহাদাৎ হোসেন, ''ঈদ-উল-ফিত্‌র'', তদেব, পৃ. ৭৩

২৭. শাহাদাৎ হোসেন, ''মহাপয়গাম'', তদেব, পৃ. ৪৫

২৮. শাহাদাৎ হোসেন, ''ঈদ-বোধন'', তদেব, পৃ. ৫২

২৯. শাহাদাৎ হোসেন, ''ইয়ারমুক'', তদেব, পৃ. ৫৯

৩০. শাহাদাৎ হোসেন, ''ইসলামে পরমতসহিষ্ণুতা'', তদেব, পৃ. ১৯৩

৩১. হাসান হাফিজুর রহমান, ''পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যসাহিত্য : কবি-মানস ও ভূমিকা বিচার'', 'আধুনিক কবি ও কবিতা', সময় প্রকাশন, ঢাকা, আগস্ট ২০০০, পৃ. ১২০

৩২. মোহাম্মদ আবদুর রব, ''প্রকাশকের কথা'', 'শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা', আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০০২, পৃ. ৪

৩৩. সৈয়দ আলী আহসান, ''কবি গোলাম মোস্তফা একটি বিশ্লেষণ'', 'কবি গোলাম মোস্তফা', সংগ্রহ ও সম্পাদনা ফিরোজ খাতুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৪, পৃ. ৭১

৩৪. গোলাম মোস্তফা, ''পরিচয়'', 'রক্তরাগ', কাব্যগ্রন্থাবলী (প্রথমখণ্ড), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১০ নভেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৬

৩৫. গোলাম মোস্তফা, ‘‘মরুর মহিমা’’, তদেব, পৃ. ৯

৩৬. গোলাম মোস্তফা, ‘‘মুসলিম’’, ‘খোশরোজ’, তদেব, পৃ. ৮২

৩৭. তদেব, পৃ. ৮৪

৩৮. গোলাম মোস্তফা, ‘‘রীফ্-শরীফ’’, তদেব, পৃ. ৯৭

৩৯. গোলাম মোস্তফা, ‘‘পাকিস্তানী গান’’, ‘তারানা-ই-পাকিস্তান’, তদেব, পৃ. ২৮০

৪০. মধুসূদন চক্রবর্তী, ‘‘পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) কবি ও কবিতা’’, ‘বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) আধুনিক কবিতার ধারা (১৯৪৭-৭১)’, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১ জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ. ১৬১

৪১. ফররুখ আহমদ, ‘‘সিন্দবাদ’’, ‘সাত সাগরের মাঝি’, কবিতাসমগ্র, আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, পৃ. ৩৯

৪২. ফররুখ আহমদ, ‘‘পাঞ্জেরী’’, তদেব, পৃ. ৬২

৪৩. ফররুখ আহমদ, ‘‘কায়েদে-আজম-জিন্দাবাদ’’, ‘আজাদ করো পাকিস্তান’, তদেব, পৃ. ৮৬

৪৪. সাঈদ-উর রহমান, ‘‘পাকিস্তান ও ইসলাম বিষয়ক কবিতা’’, ‘পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৬৩

৪৫. তদেব, পৃ. ১৭২

৪৬. তালিম হোসেন, ‘‘দিশা’’, ‘দিশারী’, কবিতাসমগ্র, মাফরুহা চৌধুরী (সম্পা.), প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৮, পৃ. ৩৭

৪৭. তদেব, পৃ. ৩৭

৪৮. তালিম হোসেন, ‘‘পাকিস্তান’’, তদেব, পৃ. ৬০

৪৯. শহীদ ইকবাল, ‘‘পাকিস্তানের একধ্বনিতে গোলাম মোস্তফা, তালিম হোসেন, রওশন্ ইজদানী, মুফাখ্খারুল ইসলাম ও অন্যান্য কবি’’, ‘বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস (১৯৪৭-২০০০)’, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৩, পৃ. ২৮-২৯

৫০. হুমায়ুন আজাদ, ''পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবৃক্ষ'', 'ভাষা আন্দোলন সাহিত্যিক পটভূমি', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১০

৫১. সৈয়দ আলী আহসান, ''মক্কা মোয়াজ্জমার পথে'', 'চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা', মোকাররম পাবলিশার্স, ঢাকা, বর্তমান সংস্করণ জুলাই ১৯৮৫, পৃ. ২৭

৫২. সৈয়দ আলী আহসান, ''আমন্ত্রণ'', 'চাহার দরবেশ', শ্রেষ্ঠ কবিতা, শিকড় প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ একুশে বইমেলা ২০০৬, পৃ. ১২৯

৫৩. সৈয়দ আলী আহসান, ''মক্কা মোয়াক্কমার পথে'', 'চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা', মোকাররম পাবলিশার্স, ঢাকা, বর্তমান সংস্করণ জুলাই ১৯৮৫, পৃ. ৩০

৫৪. সৈয়দ আলী আহসান, ''বেদনাবিহীন স্বপ্নের দিন'', সাঈদ-উর রহমান, 'পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৮৪

৫৫. সৈয়দ আলী আহসান, ''ভূমিকা'', 'কাব্য সমগ্র', লালন প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮১, পৃ. ১৫-১৬

৫৬. সাঈদ-উর রহমান, ''পাকিস্তান ও ইসলাম বিষয়ক কবিতা'', 'পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৮৪